আলো-ছায়ার অন্তরালে : আদিম থিয়েটার উৎস সন্ধান

অ রি ন্দ ম ঘো ষ

ঘন জঙ্গল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে মশালের আলো। ডুম্-ডুম্-ড্রিম-ড্রিম—মাদল আর ঢাকের আওয়াজ। কান পাতলে সমবেত গলায় এক দুর্বোধ্য ভাষায় গানের সুর ভেসে আসছে। কাছে এগোলে স্বল্প পোশাকে সুসজ্জিত একদল পুরুষ-রমণী নাচছে, কথা বলছে, নানারকম ভঙ্গীমায় কোনো এক গল্পকে প্রকাশ করছে। চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও একদল পুরুষ-রমণী। তারা বাঁশের পাত্রে তরলে চুমুক দিচ্ছে আর ক্রমাগত শরীর দোলাচ্ছে এক আদিম ছন্দে। ভালো করে কান পাতলে হয়তো শোনা যাবে

"ইং জুরি কুড়ি হঁ বালুক কোয়া
ইংদ কুঁয়ারিযৌ
ইঞ্জদং অডং চালাঃক এট্টাদিসাম।
দারেরে জাপাঃক কাতে
চান্দোসে সামংকাতে।
চান্দো ক্বয়েমে দিনি জুরি।

আদিবাসী বলতে হয়তো এই ছবিটাই মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। সরল, সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যেও, প্রকৃতি ও সমাজের নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সেই আদিম যুগ থেকে আদিবাসী সমাজে সংস্কৃতি ও উদ্যাপনের একটা অদ্ভুত সহজ উৎসা রয়েছে। জীবনযাপনের নানাবিধ প্রকারের মধ্যে অনুষ্ঠান ও উৎসবের তাৎপর্য আদিবাসী সমাজে ভীষণভাবে বিদ্যমান। আর সেটা একটা সমবেত শিল্প। সবাই মিলে কিছু করে দেখানোর এবং কিছুক্ষণের জন্যে মনোরঞ্জনকারী উপাদান নিয়ে, আর বিষয়গত বৈচিত্র্যে সেই সমবেত অবস্থান যে প্রযোজনা উপস্থাপন করল তাই কি আজকের আধুনিক থিয়েটারের তথাকথিত দলগত উৎকর্ষের আদি রূপ? যা ক্রমে ক্রমে জনজাতি গোষ্ঠীর প্রভেদ, প্রকরণ ও সমাজ সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনে হয়ে ওঠে লোকশিল্প? তবু দীর্ঘসময়ের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজও তার ছন্দ, তার আদিম স্বর ও সুর হয়ে ওঠে চিরকালীন।

অনেকটা পিছনে যাওয়া যাক। প্রায় ৩৫ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশের তানজানিয়ার স্যাঁদিম্যান আগ্নেয়গিরিতে ঘটেছিল এক বিরাট বিস্ফোরণ। আগ্নেয়গিরির সামনে ছিল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি যা লাটোলি নামে পরিচিত। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে শুরু হয়েছিল প্রবল ঝঞ্ঝা, পূর্ব দিকে থেকে আসা এই ঝঞ্ঝা আর অগ্ন্যুতপাতের কালো ছাই এক ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করল, শুরু হল ভয়ংকর বৃষ্টি। সমস্ত সমতলভূমি ও জঙ্গল ঢেকে গেল ছাইয়ের আস্তরণে, ঢেকে গেল সুউচ্চ গাছের মগডালও। সমস্ত প্রাণীকূল গেল হকচকিয়ে—সবাই পালানোর পথ খুঁজছে। সব পশুপাখি, এমনকি পোকামাকড়ও। ঠিক তখনই আরেকটা অগ্ন্যুৎপাত। আবার সেই কালো ছাই ঢেকে দিল সবকিছু। বহু প্রাণী হয়ে গেল জীবন্ত ফসিল। ঢেকে গেল সব গুহা-গহ্বর। ঢেকে গেল বহু প্রাণীর পদচিহ্ন। অনেক বছর পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বহু পদচিহ্নের মাঝে আবিষ্কার করলেন কয়েকটা পদচিহ্ন যা অন্যগুলোর সাথে মেলে না। তিন জোড়া পদচিহ্ন। যেন তিন জোড়া মানুষের পা। যারা চারপেয়ে নয়। খাড়া হয়ে হাঁটত।

অনেকটা আধুনিক মানুষের মতো। যাদের নাম দেওয়া হল, Australopithecus Afarensis—আধুনিক মানুষের আদিম পূর্বসুরী।

এরপরে সময় এগিয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে জীবাশ্ম নির্দশন হিসেবে পাওয়া গেছে তাতে প্রাগ-ঐতিহাসিক অবস্থান থেকে আজকের আধুনিক মানুষ পর্যন্ত বহু গণ, প্রজাতি ও উপপ্রজাতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাক-আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স নিয়ান—ডার্থালেনসিস থেকে আধুনিক মানুষ বা হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স-এর বিবর্তনও প্রায় তিরিশ হাজার বছরের পুরোনো।

এই দীর্ঘ বিবর্তনের সময় ধারায় প্রস্তর যুগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্নপ্রস্তর যুগ (Palacolithic Period), মধ্যপ্রস্থর যুগ (Mesolithic Period) আর নিম্নপ্রস্তর যুগ (Neolithic period)-এর সময়সীমা প্রায় ২০ লক্ষ বছর। আদিম মানুষের এই তিন পর্বে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া যা ডারউইন বলছেন 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' (Survival of the fittest) সেখানে বেঁচে থাকার রসদ হিসেবে প্রথম যে কৌশল তাকে রপ্ত করতে হল, তা হল শিকার পদ্ধতি। আর যতদূর প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থলিপি ও প্রস্তরখোদিত বিবরণ ও ছবিতে, তাতে দেখা যায় এই শিকারকে ঘিরেই গড়ে ওঠে এক শিকার সংস্কৃতি। ঘুরে ঘুরে খাদ্যসংগ্রহ ও শিকারবৃত্তি থেকে উত্তরণ ঘটে চাষবাস ও পশুপালনের মতো ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের যা জীবননির্বাহের প্রধান অবলম্বন। আর এই বিবর্তনের প্রেক্ষিতে মানুষ খুঁজতে চেয়েছে তার যা কিছু অনুভব তাকে শৈল্পিক প্রকাশের আঙিনায় উপস্থাপন করতে। সেখানে তিনটে মূল উপাদান ছিল শিকার, নৃত্য ও জাদুবিশ্বাস।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী E. B. Tylor ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির চেতনাকে একটা কাঠামোগত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলছেন, মানুষের সংস্কৃতি এমন একটা জটিল সামগ্রিক সত্তা যার মধ্যে সামাজিক জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্পকলা, নৈতিকতা, আইন, রীতিনীতি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কর্মদক্ষতা ও অভ্যাস বিকশিত হয়। আর একদিকে সমাজবিজ্ঞানী Radclif Brown সংস্কৃতিকে মূলত একটা নিয়মকানুনের ধারা হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। Alfred Krober তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন মানবগোষ্ঠীর অভ্যাস, কলাকৌশল ধারণা এবং মূল্যবোধের সমষ্টি সংস্কৃতির সামগ্রিক গঠনরীতির পরিচায়ক ও বাহক। Leslie White বলছেন যে সংস্কৃতি হল প্রতীকধর্মী, অবিচ্ছিন্ন, ক্রমবর্ধিষ্ণু ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া। এর মধ্যে খুবই বিশদে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনস্তাত্বিক বিকাশ ও তার প্রকাশভঙ্গীমা নিয়ে খুব গভীর পর্যালোচনা করেন Thomas H Huxley তার Enquiry into man's place in nature বইতে। এইসব মতবাদই একটা তথ্যকে প্রকাশ করে বা ভিত্তিকে জোরদার করে। তা হল, বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চেয়েছে নিজেকে প্রকাশ করতে যেটা তার দৈনন্দিন জীবননির্বাহের শর্ত থেকে বেরিয়ে অন্য কিছু উপায়ে, নতুন প্রকাশ ভঙ্গীমায়। এই বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় আলাদা হয়ে গেছে বনমানুষ ও মানুষের প্রকাশভঙ্গীমা।

প্রাচীন গ্রীক লোককথায় মানুষ সৃষ্টির যে কথা আছে তা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সম্ভবত প্রথম দেখেন গ্রিক দার্শনিক জেনোফেনস। তিনি তার বিশাল পরিব্রজনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন সমাজ ও সৃষ্টি মানুষের সৃষ্ট। পরে হেরোডোটাসের সুপরিচিত ও চিন্তাশীল পরিব্রাজকের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন সামাজিক রীতির ও অভ্যাসের আধারে প্রায় পঞ্চাশটি ভিন্ন মানবজাতির জীবনযাত্রার বর্ণনা জানা যায়। পরবর্তীকালে প্লেটো ও সক্রেটিস দুজনেই সমমত ব্যক্ত করেন যে সৃষ্টির আকাঙ্খা ও তাঁর মধ্যে সৌন্দর্যতত্ত্ব মানুষের চিরন্তন মূল্যবোধের প্রতিফলন।

E.B.Tylor-এর Researches into the early history of mankind (১৮৬৫) এবং আর একটি বই (১৮৭১) ওই বছরেই প্রকাশিত Louis Henry Morgan-এর Systems of consangunity and affinite of the human family। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বইতে দেখা যায় মানুষের অস্তিত্বের প্রায় নব্বই শতাংশ সময় কেটেছে শিকার ও সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। আদিবাসী জীবনচর্চার বৈচিত্রময় রূপ থেকেই আমাদের মানবসমাজের ঐতিহ্য সন্ধান শুরু হয়।

ফিরে আসি থিয়েটারের কথায়। আর আমাদের এই আলোচনার ভিত্তিভূমি হোক ভারতবর্ষ। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার তথ্যে পেশাভিত্তিক যে জাতিবিন্যাস করা হয় তাতে চাষবাস ও পশুপালন জাতিকে 'জঙ্গলের আদিবাসী' বা 'বনবাসী' (forest tribe) হিসাবে দেখানো হয়। সে সময় প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ এই 'বনবাসী' হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তীকালে ১৯২১-এ tribal aminists or people following tribal religion এবং ১৯৩১-এ এই জনগোষ্ঠী 'আদিম জনজাতি'

(Primitive tribe) হিসাবে চিহ্নিত হয়। আজকের এই সময়ে ২০০১-এর জনগণনার ভিত্তিতে ভারতে আদিবাসী জনসংখ্যা ৮ কোটির ওপরে।

এই সব জনগোষ্ঠীর ভৌগোলিক ও পরিবেশগত অবস্থান বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা। তাই সংস্কৃতি ও ভাষাও আলাদা। কিন্তু ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় কিছু লক্ষণ একদমই সমগোত্রীয়। এরা স্বভাবকোমল ও শান্তিপ্রিয় অথচ কঠোর পরিশ্রমী, নিজেদের যা কিছু অভাব তা নিজেরাই মোচন করতে তৎপর, অথচ সবাই মিলে আনন্দে থাকতে অভ্যস্ত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নাচ-গান-মাদল বাজানো ভালোবাসে আর সময় পেলেই চিত্তবিনোদন করতে ভালোবাসে। ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে যদি ভাবা যায় তাহলে থিয়েটারের প্রাথমিক চাহিদা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খ মেলে। W.G. Archer তাঁর The Blue Grove (১৯৪০) বইতে ওঁরাওদের সংস্কৃতি ও আচার সম্বন্ধে কি লিখছেন দেখা যাক—

"A few notes should he added on Uraon 'Character' To the earliest observers, a capacity fo cheerful hard work was the most notable character of the Uraons; and a sturdy gaiety, an exultation in bodily physique and a sense of fun are still their most obvious qualities. These are lincked to a fundamental simplicity—a tendency to see an emotion as an action and not to complicate it by postponement or obligation, the final picture is of a kind simplicity and smiling energy"—এই লেখা থেকে বোঝা যায় আদিবাসী জনজাতির যে প্রকাশভঙ্গীমা, সেটা শুরু থেকেই শুধুমাত্র শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ নয় সঙ্গে আবেগের একটা অন্তর্লীন সম্পর্ক আছে—দুইয়ে মিলে সেটা যে রূপক হয়ে ওঠে তাতে নাট্যপ্রক্রিয়ার সব উপাদানই রয়েছে।

যে আন্তর্জাতিক তথ্য ও তত্ত্ব খানিকটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম তার কতগুলো প্রয়োগ ক্ষেত্র আছে। যেহেতু এখানে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই, তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে আদিবাসী সংস্কৃতি ও পরবর্তীকালে লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে প্রথমে ভাষা ও তারপরে কথা—এই যে উত্তরণ সেটার কারণ মনুষ্যসমাজের বিবর্তনের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব ও দর্শনের নিবিড় সম্পর্ক। ভাষাতত্ত্বের এক জায়গায় ম্যাক্সমুলার বোঝাতে চাইলেন প্রাচীন ভারতে আর্যদের যে সামাজিক বিকাশ এবং তাদের সমস্ত বিশ্বাসের আধার সূর্যকেন্দ্রিক। মানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বিরোধ বা আলো-আঁধারের বিসমতা। প্রাচীন আদিবাসী সমাজ থেকে যে লোকসংস্কৃতির ক্রমবিকাশ তা আর্য বা অনার্য যাই হোক, সেটা পুরোপুরি পুরাণ নির্ভর। এবং সেটার দেশান্তর বা রূপান্তর হয়েছে। থিওডর বেনফে জার্মান ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করতে গিয়ে দেখলেন সেই কাহিনিগুলোর সঙ্গে ইউরোপীয় লোককথার সাদৃশ্য। আর লক্ষণীয় বিষয় এই যে, বেনফে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন সব লোককথার আদি উৎসভূমি ভারতবর্ষ। এক দেশের লোককথা আর এক দেশে চলে যায় স্থান-কাল-পাত্রের হাত ধরে। বলা হল, এই দেশান্তর প্রক্রিয়া ভারতবর্ষ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে মধ্য এশিয়া, আফ্রিকা হয়ে ইউরোপ, পূর্বে-তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া হয়ে পূর্ব আর উত্তর-ইউরোপ হয়ে দক্ষিণে চলে এল। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সেখানে আদিবাসী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হল পুরাণ ও প্রাচীন লোককথা। সেটা যেন শৈশব অবস্থা। সেখানে এল ফ্রয়েড ও ইয়ুং-এর নতুন দৃষ্টিকোণ যেটা মূলত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। যে নাট্য মনস্তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে বিকশিত হল তার গল্পের উপাদান হল লোককথা, পুরাণ, প্রবাদ, গীতিকা এইসব।

আদিবাসী সমাজের যে সংস্কৃতি, তার গোড়া থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে যে সংঘবদ্ধ শিল্প আমরা দেখি তাতে যেমন গল্প আছে, তেমনই নাচ, গান, শরীর সবকিছু নিয়ে আচার, অনুষ্ঠান সমস্তটা নিয়ে সেটা নাট্যকলা হয়ে উঠছে। সেটা তাত্ত্বিকেরা সাহিত্য না বলে উপসাহিত্য বা Para-literature বলতেই পারেন। কিন্তু ব্যক্তিমানুষের যে চেতনা তাকে উপেক্ষা করা যায় না। এই চেতনাই একটা গোষ্ঠীকে গড়ে তোলে। ধরা যাক, পশ্চিমবঙ্গের ছৌ। সেটা যখন স্বাস্থ্যসচেতনতার নিরিখে ব্যবহৃত হয়, তখন সেটা কী ফলিত লোকসংস্কৃতি (Applied Folklore) না লোকজনসংস্কৃতি (Public Folklore)? কিন্তু বিষয়গত বৈচিত্র্যে যদি নাট্যউপাদান দেখতে হয় তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যায় এটা অবশ্যই লোকনাট্য।

উপরের আলোচনা করার উদ্দেশ্য একটাই। দেশ-কাল-পরম্পরার যে প্রাচীন ঐতিহ্য তার উপাদান বিশ্লেষণ করলে একটা আন্তর্জাতিক সাদৃশ্য মেলে। রাশিয়ার লোকসংস্কৃতিবিদ্ ভ্লাদিমির প্রপ-এর বই "The morphology of Folklore"-এর উল্লেখ এবং প্রামাণ্য তথ্যাদি আছে। তার আরও একটি বই

"Theory and History of Folklore"-এ দেখা যায় এই যে প্রাচীন সংস্কৃতি তার সঙ্গে জাতি-ইতিহাস বা Ethnology-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মূলতত্ত্ব হল এই যে, বিভিন্ন জাতি বা উপজাতির যে নাট্যউপাদান তাতে স্থান, কাল, পাত্র ও চরিত্রের পরিবর্তন হলেও তার ক্রিয়া (Action) ও কর্মশীলতা (function) সবক্ষেত্রেই স্থায়ী। দর্শকের কাছে অবশ্য function ও action-এর বিশেষ তফাৎ থাকে না, কেননা সেখানে গল্পটাই আসল।

এই কর্মশীলতার উদাহরণ হিসাবে আদিবাসী ইতিহাসের চারটি গল্পের প্রসঙ্গে আসা যাক। প্রপের অনেক উদাহরণ থেকে বেছে নিলাম।

গল্প ১ঃ রাজা একজন সাহসী পুরুষকে একটি ঈগল উপহার দিলেন। ঈগল সেই বীরকে একটি অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

গল্প ২ঃ এক দাদু তার নাতিকে একটা ঘোড়া উপহার দিলেন। ঘোড়া নাতিকে একটা অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

গল্প ৩ঃ একজন যাদুকর ইভানকে একটি নৌকো দিল। নৌকো ইভানকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

গল্প ৪ঃ রানি ইভানকে একটি আংটি দিলেন। সেই আংটি থেকে এক দৈত্য এসে ইভানকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল।

এই চার গল্পে দুটো ক্রিয়াশীলতা আছে—দেওয়া এবং নিয়ে যাওয়া। এটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যাবে প্রথমে একটা যাদু বস্তু (magic object) পাওয়া— ঈগল, ঘোড়া, নৌকো, আংটি। দ্বিতীয় হল, দুই রাজ্যের মধ্যে স্থান পরিবর্তন (displacement in space) বা ভ্রমণ। পরিবর্তনের পরে কী হল সেখানে নাট্যউত্তেজনা। দর্শক ভাবতে থাকে, কল্পনা করতে চায়। ঠিক এই জায়গাতে নাট্যমুহূর্ত এবং তার চরিত্রের স্থানের বিচ্ছিন্নতা (Alienation) কী ব্রেখটীয় নাট্যভাবনা ও ব্যাখ্যার সাদৃশ্য নিয়ে আসে না? এই যে প্রণোদন, এটাই সেই গল্পকে নাট্যে পরিবর্তন করে।

এরকম অনেক উপাদানগত সাদৃশ্য বিভিন্ন দেশের পুরাণ, রূপকথা, লোকগাথাতে পাওয়া যাবে যা প্রাচীন আদিবাসী সমাজ থেকে আজকের লোকনাট্য—সব ক্ষেত্রেই কোনো গোষ্ঠীকে তা উদ্বুদ্ধ করেছে একটা দলগত উপস্থাপনা করতে। যা নাট্যউপাদানে ভরপুর। আদিবাসী বা লোকথিয়েটারের মূল উৎস ও ভাবধারার সূত্রপাত সেখানেই।

সারা বিশ্বের আদিবাসী নাট্যসংস্কৃতির ধরণ ও প্রকরণ বিশাল বৈচিত্র্যে ভরা। সে আলোচনার পরিসর এখানে নেই। যদি ভারতবর্ষের দিকে তাকাই সেখানেও অজস্র বৈচিত্র্য। খুব সংক্ষেপে ভারতবর্ষের কিছু আদিবাসী থিয়েটার ও সংস্কৃতির উল্লেখ করলাম যা থেকে এই আদিম সংস্কৃতির প্রাথমিক সূত্র পাওয়া যাবে। আদিবাসী অথবা লোকনাট্যের এই বিশাল ভাণ্ডারে ঘুরে ফিরে আসে যে উপাদান তাতে প্রেম-প্রণয়, সম্পর্ক ও ঈশ্বরের প্রাচুর্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

ভবাই

এই ঘরাণা দেখা যায় রাজস্থান ও গুজরাটে। গুজরাটের উনকা গ্রামে এই গোষ্ঠীর লোকনাট্য দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুষঙ্গে দেবী অম্বার প্রতি অর্ঘ্যস্বরূপ এই পালা হয়। যেটা অচিরেই হয়ে ওঠে নাট্যপালা। অনেক ছোট ছোট নাট্যাংশ দিয়ে তৈরি এই প্রযোজনাকে চিহ্নিত করা হয় ভেশা বা সংগা নামে। প্রত্যেক ভেশার নিজস্ব গল্প আর স্থান আছে। নাচগান ও বাজনা এতে থাকেই। কথকের যে আদি রূপ তা পাওয়া গেছে এই ভবাই প্রযোজনা থেকেই। একজন সূত্রধার যে প্রবীণ চরিত্র, সে সমস্ত পালার নির্দেশক ও প্রবীণ অভিনেতা। এবং প্রযোজক। রাজস্থান ও গুজরাটের প্রযোজনায় সামান্য ফারাক হল রাজস্থানের ভবাই-তে নাচ-গান বেশি, আর গুজরাটের ক্ষেত্রে অভিনয়।

দশকাঠিয়া আর ছাইতি ঘোড়া

এই প্রযোজনা দেখা যায় ওড়িশা অঞ্চলে। একটা কাঠের বাদ্যযন্ত্র যার নাম কাঠিয়া, সেটার সাহায্যে এক ভক্ত ও ঈশ্বরের উপাখ্যান বিবৃত হয় নাটকীয় ঢঙে। দুজন সূত্রধার থাকে, একজন গান করে, একজন কথা বলে। একদল বাদক ঢোল আর মহুরী বাজায়। তার তিনজন চরিত্র থাকে। বাঁশ আর কাপড় দিয়ে নকল ঘোড়া বানানো হয় যার মধ্যে ঢুকে গিয়ে নাটক হয়। সূত্রধার বাইরে থাকে।

গোন্ধল

মহারাষ্ট্রের প্রাচীন পুরাণ কথা ও বিশ্বাস নিয়ে এই নাট্যরীতি। বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এই পালা হয়।

বিভিন্ন পালা পার্বণে এই প্রযোজনা হয়। অনেক নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি হয় যখন কথক একের পর এক ঘটনা বিবৃত করে এবং তা অভিনীত হয়।

গারোদা

গুজরাটির এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী যে প্রযোজনা করে তাতে গল্প বলার সঙ্গে নানারকম হাতে আঁকা ছবি দেখিয়ে গল্পের ঘাত-প্রতিঘাত বিবৃত হয়।

যাত্রা

পূর্বভারতের এই নাট্যরীতি বহু প্রাচীন। আদিবাসী সমাজে শিকার উৎসব পালনের অঙ্গ হিসাবে যাত্রার উদ্ভব। যা মূলত: বাংলা, আসাম এবং ওড়িশায় দেখা যায়। শিকার করে মিছিল করে ফেরার যে শোভাযাত্রা তা গানে কথায় অনুষ্ঠিত হত। শোভা মানে রূপক এবং যাত্রা মানে চলা। দুটো মিলে এই প্রাচীন ধারা যাত্রা। জঙ্গলের পথে এই অভিনয় হত, সেই রীতি মেনে আধুনিক যাত্রাও খোলা মাঠে হয়। এমনকি পথনাটকের মূল ভাবনায় এসেছে ওড়িশার সহি-যাত্রা থেকে যা অন্য কোথাও দেখা যায়নি। পুরাণ, বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনিই বেশি দেখা যায়।

কারিয়ালি

হিমাচল প্রদেশের সিমলা, সোলান ও সিরমুর অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিদের এ এক চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় নাট্যপ্রযোজনা। বর্ষার পরে ফসল তোলার সময় যে উৎসব সেখানে এই পালার সূত্রপাত। এখন দীপাবলির পরে এই প্রযোজনা হয়। খোলা মাঠে এই প্রযোজনা হয়। ছোট গল্প, প্রহসন, গীতিকার—প্রায় সবধরনের বৈচিত্র্য এতে দেখা যায়। যেদিন প্রযোজনা হয় সেদিন একের পর এক উপস্থাপনা হয় সারারাত ধরে। বহু রকমের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়। যেমন প্রাচীনকালের চিমটা, নাগারা, কার্নাল, রণসিংহ থেকে এ যুগের সানাই, বাঁশি, ঢোলক, খঞ্জরী—সবকিছুই। পার্বত্য উপজাতি ও আদিবাসীরা আগুন জ্বেলে তার পাশে এই প্রযোজনা করে।

কীর্তন

এই প্রাচীন লোককথার ধরন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে দেখা যায়। গানের মাধ্যমে গল্প বলা ও অভিনয় করা। এর বিভিন্ন ধারার বিভিন্ন নাম আছে যেমন কথাকল্লেশম, হরিকথা। প্রাচীন আদিবাসী সমাজে কোনো কিছু শিকারের উদ্‌যাপন হলে প্রচণ্ড উচ্চৈঃস্বরে দেবতার উদ্দেশ্যে যে স্তুতি করা হত তার থেকেই এই রীতির উদ্ভব।

খড়াল

এটা মূলত রাজস্থানের প্রাচীন নাট্যপদ্ধতি। এখানে গান ও নাচের আধিক্য বেশি। এই পালা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—তামাশা, রামমত্র, নৌটংকী, মাচ, স্বং ইত্যাদি। আবার মধ্যপ্রদেশের মালওয়া অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে মাচ নাট্যরীতি চলছে। যেটা বর্তমান উজ্জয়ন অঞ্চলে উদ্ভুত। প্রেম ও ঈশ্বর এই দুটোই সাধারণত এই প্রযোজনাগুলোর বিষয়। অন্য রীতিগুলোও আলাদা করে উল্লেখ করছি।

স্বং

উত্তর ভারতের প্রধান ও প্রাচীন রীতি হল স্বং। বাজনার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়। রেওয়ারি জাতির লোকনাট্যের উদ্ভব এই ধারা থেকেই। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার সংলাপকে জোরাল ও আকর্ষণীয় করে।

তামাশা

আদিম সমাজের উৎসবের অঙ্গ ছিল কৌতুকপ্রিয়তা এবং কোনো ঘটনার অনুকরণ। এই রীতির উদ্ভব মহারাষ্ট্রের জঙ্গলমহলে। শুধু কৌতুকই নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্কের যৌনতাও এখানে এসেছে। যা যৌন উদ্দীপক গান ও নাচের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, প্রাচীনকাল থেকেই নারীর ভূমিকায় মহিলারাই অভিনয় করত। পরবর্তীকালে পুরাণের গল্প, বিশেষ করে কৃষ্ণলীলার আদিরস সম্পর্কিত ঘটনাবলী এই রীতির নাট্যউপাদানে দেখা যায়। যৌন সম্পর্কিত রঙ্গরস এখানে প্রাধান্য পায়।

ওজা-পালি

ওজা-পালি প্রাচীন আসামের পার্বত্য আদিবাসী জনজাতির একটা আকর্ষণীয় নাট্যরীতি। নানারকম রূপকের মাধ্যমে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি ও অভিনয় করে গল্প বলার ধরন এর বৈশিষ্ট্য। এই রীতিতে দৃশ্যরূপকের প্রাধান্য দেখা যায় যা পরবর্তীকালে উত্তর-পূর্ব

ভারতের লোকনাট্যের বিশেষ প্রকরণ। ওজা হল মূল গায়ক-বা সূত্রধার আর পালি হল কোরাসের সমবেত অভিনেতা-অভিনেত্রী। আসামের আদিবাসী সমাজে সর্পদেবী মনসার পূজা খুব জনপ্রিয়। মনসা পুজোর পার্বণ-রীতিতে এই অভিনয়ের উদ্ভব ও প্রচলন।

পোয়ারা

মহারাষ্ট্রের আদিবাসী সমাজের নাট্যরীতির আর এক ধারা পোয়ারা। প্রাচীন গোন্ধলী রীতির সাযুজ্য অনুযায়ী শিকারে প্রাণীহত্যার যে জয়োল্লাস, সেই নাট্য উত্তেজনার থেকে এই রীতির উদ্ভব। বহু পরে এর লোকনাট্য কাহিনিতে সেই হত্যার অনুষঙ্গ আসে শিবাজী কর্তৃক আফজলখানকে হত্যার ঘটনা।

পাণ্ডবাণী

ছত্রিশগড়ের সব থেকে জনপ্রিয় আদিবাসী নাট্যরীতি হল পাণ্ডবাণী। পঞ্চপাণ্ডবের কাহিনিসূত্র থেকে দুধরনের প্রযোজনা দেখা যায়—তা হল কপিলক ও বেদমতী। একজন সূত্রধর গায়কের সঙ্গে একদল শিল্পীর নাচ-গান ও কথকতার ছন্দ এর মূল বৈশিষ্ট্য। এটা ছিল আদিবাসীদের বিনোদনের মূল উপজীব্য। গোটাকয়েক বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ও সংলাপ এবং গানের কোলাজে এই প্রযোজনা খুবই উচ্চপ্রশংসি। এখনও এই রীতির অভিনয়ে প্রাচীন রীতি অনুসৃত হয়, যা আধুনিক থিয়েটারের আঙ্গিকে নয়।

ভিল্লু-পাত্তু

দক্ষিণভারতের তামিলনাড়ু অঞ্চলের আদিবাসী শিকার পদ্ধতির মূল অস্ত্র ছিল ধনুক। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এর শুরু, যা ধনুক আকৃতির এক বাদ্যযন্ত্র দিয়ে শুরু। ভিল্লু-পাত্তুর মানে হল ধনুক গান। সাত-আটজনের একটা কোরাস ওই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে একজন সূত্রধর গায়কের সঙ্গে তাল মেলায়। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণকথা এই নাট্যরীতির মূল উপাদান।

অন্যান্য প্রাচীন আদিবাসী সমাজ

মেবারের তীরন্দাজ উপজাতি যারা ভিল নামে পরিচিত এবং যাদের অস্তিত্ব বর্তমান গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরা। প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় উপজাতির গোন্দ যারা এখন মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড় আর ওড়িশায় দেখা যায়। এছাড়া খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বিত মার প্রজাতি যারা বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়, মিজোরাম, কাছাড়, ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে থাকে যাদের এখন চিন-কুকি-মিজো সম্প্রদায়ের জনজাতি বলে চিহ্নিত। এছাড়া মেঘালয়ের খাসি উপজাতি আর পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়, ওড়িশার সাওঁতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, আসামের দিমাসা-দিন-ফিসা উপজাতি, মধ্যভারতের পার্বত্য অঞ্চল আর অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাচীন উপজাতি চেঞ্চু—এরকম আরও অনেক আদিবাসী উপজাতি এখনও রয়েছে যারা বিনোদনের প্রধান উপকরণ হিসেবে দলগত শিল্পে ও নাট্যরীতিতে বিশ্বাসী। এখনও এরা পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে নিজেদের মতো করে বাঁচিয়ে রেখেছে আজকের আধুনিক থিয়েটারের আদিম উৎস সন্ধান।

শেষ করব খাসি-উপজাতির এক নাটকের গল্প বলে। যেখানে প্রকৃতি ও সমাজের টানাপোড়েনের রূপক নাট্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। যেখানে পাপ-পুণ্যের অভিঘাতে প্রকৃতির দায়ভার পরিশোধিত হয়। গল্পটা এইরকম—একটা নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সব গ্রামবাসী সেজেগুজে সেখানে এল। শুরু হল একের পর এক নাচ। সারাদিন চলল। ঠিক যখন সন্ধে হচ্ছে আর নাচের শেষে সবাই ঘরে ফেরার কথা ভাবছে তখন সেখানে এল চাঁদ আর সূর্য। তারা ভাই-বোন। তারা নাচ শুরু করল। খোলামেলা উদ্দাম ভঙ্গীতে। খুব ভালো নাচছিল দুজনে। কিন্তু তাদের সবাই ধিক্কার দিল কারণ ভাইবোন তো ওভাবে নাচতে পারে না। সেই ধিক্কারের লজ্জায় সূর্য মুখ ঢেকে সরে গেল আর পৃথিবীতে নামল অন্ধকার।

এখানে অন্ধকার নামার প্রাকৃতিক সহজ কারণেও সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল সামাজিক নীতিজ্ঞান। ভাইবোনের সম্পর্ক শুদ্ধ। এখানে সহোদর-সহোদরা নয়, এক গোত্রে সবাই ভাইবোন। এবং এক গোত্রে বিবাহ-সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ নিয়ম ভাঙলে, অথবা যৌন সম্পর্ক হলে চরম শাস্তি প্রাপ্য। চাঁদ ও সূর্যের নাচের পর যে ধিক্কারে সূর্য মুখ ঢেকে পালিয়ে গেল তা সমাজের নীতিজ্ঞান। অন্ধকার নেমে আসা প্রাকৃতিক কারণ হলেও সমাজনীতির প্রতীক। ভাইবোনের যৌনসম্পর্ক অন্ধকার ডেকে আনে। হাজার বছরের প্রাচীন এই পালা গল্পে কোথাও কী ছায়া পড়ে না Leo Totstoy-এর 'Power of darkness'-এর যা বাংলা মঞ্চে খ্যাত 'পাপ-পুণ্য' নামে। সেই নীতি আর অন্ধবিশ্বাসের লড়াই নিয়ে বনে-জঙ্গলে আজও চলছে আদিবাসী থিয়েটার বা আদি থিয়েটার। দেশে-দেশান্তরে তার বুনো গন্ধ এখনও সজীব।